Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 228-233

সাঁওতালদের সহরায় উৎসব

শ্রী চিরঞ্জিত মাণ্ডি

সাঁওতালদের জনগোষ্ঠীই সাধারণ মানুষের পরিচয়ে আদিবাসী নামে পরিচিত। দৈহিক গঠন, মুখের আকৃতি প্রভৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা প্রোটো-অস্ট্রেলীয় জাতিভুক্ত আর ভাষাগোষ্ঠীর বিচারে অস্ট্রো-এশিয়াটিক শ্রেণির পার্বত্য ও অরণ্যচারী মানুষরূপে চিহ্নিত। নৃতাত্ত্বিক গুণে এদের আদিম অধিবাসী বলা হয়ে থাকে। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা এদের নানা অভিধায় ভূষিত করেছেন- আদিবাসী, উপজাতি, জনজাতি। এই সাঁওতাল শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন অতুল সুর মনে করেন— 'কিংবদন্তী অনুসারে তাদের পূর্বে নাম ছিল খারবার।' 'খর'শব্দ 'হর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। হর শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মানুষ। মেদেনীপুরের সাঁওতাল পরগণায় এসে তারা যখন বসবাস করতে শুরু করে তখন তাদের নাম হয় 'সাঁওতাল। প্রখ্যাত সাঁওতালী গবেষক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে সাঁওতাল শব্দটির উৎস প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে— 'সাঁওতালী শব্দটি সম্ভবত সাওনতার শব্দের অপভ্রংশ এবং এই নামটি তারা এই দেশে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার পর গ্রহণ করে।'আবার ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'সাঁওতাল শব্দটি এসেছে সম্ভবত সংস্কৃত 'সামন্তপাল' কথা থেকে।'

সমাজ-ভাষা সংস্কৃতির বিচারে সাঁওতালরা আদিম মত বা বিশ্বাসের অধিকারী। সাঁওতালদের প্রধান ভাষা 'সাঁওতালি' নামে পরিচিত। তারা এই ভাষাতেই কথা বলে। এদের সমাজে প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে যা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। গ্রামে তিনজনের দ্বারা শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এক, *মাঝি* দুই, *পরগনাইত* তিন, *জগ পরগনাইত।*

সাঁওতাল সমাজে নিজস্ব রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, উৎসব, পূজা বিদ্যমান। এই সমাজের মানুষরা প্রকৃতির পূজক হিসেবে বিখ্যাত। এরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে না। তবে কোথাও কোথাও মূর্তি পূজা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে গাছের তলে থানের

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মতো বেদী তৈরি করে পূজা করা এই পূজার স্থানকে ‘জাহের স্থান’ বলে। তবে বাঙালিদের মতো তাঁদের মধ্যেও বারো মাসে তেরো পার্বণ প্রচলিত আছে। বছরের প্রায় প্রতিটি মাসে তাদের পূজা-পার্বণ পরব অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালদের পূজা উৎসব বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। তাদের দেব-দেবী পূজা অর্চনার সাথে উৎসবের এক অনন্য মূর্তি নির্মিত হয়। বাহা উৎসব, সাকরাত, করম উৎসব, বাতুলী, কদলেতা, বাইন প্রভৃতি উৎসব সাঁওতালদের মধ্যে বিখ্যাত। যদিও এগুলো ধার্মিক উৎসব।

‘সহরায়’ উৎসবকে সাঁওতাল সমাজের সব থেকে বড়ো উৎসব বলে মানা হয়। সকল সাঁওতালরা এই উৎসব পালন করে। দাদু-ঠাকুরদাদের কাছে শোনা গেছে যে, ‘সহরায়’ বড়ো উৎসব বা পরব। জনশ্রুতি আছে রাম পরগণার রাজা দিশমপতি কিস্কু তাঁর রাজ্যের প্রজাদের মঙ্গল কামনায় এই উৎসব প্রচলন করেছিলেন। আদিকাল থেকে এই উৎসবটি পাঁচদিন ধরে খুব জাঁকজমক ও আনন্দ সহকারে পালন করা হয়। অন্যান্য উৎসব থেকে ‘সহরায়’ উৎসবটা পাঁচদিন ধরে পালন করা হয় বলে একে হাতির সাথে তুলনা করা হয়। তাদের গানে এর প্রতীকি রূপ ধরা পড়েছে—

‘দিদি লো দিদি বড়ো দিদি- দিদি লো দিদি মেজো দিদি
হাতির মতো উৎসব দিদি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

’ সহরায় উৎসবটি বিশেষ করে কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে পালিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাসে পালন করা হয়। যেমন ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া এলাকায় পৌষ মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। সহরায় শব্দটির অর্থ নিয়ে সাঁওতাল পণ্ডিতদের মুখ থেকে শোনা যায় ‘সহরায়’শব্দটির মূল অর্থ ‘সারহত্তি। যার অর্থ দাঁড়ায় ‘ধন্যবাদ’বা সন্মানিত বোধ। ‘সহরায়’ উৎসবটির সূচনা প্রসঙ্গে জানা যায় যে- সাঁওতালরা ছিল আদিকাল থেকে চাষবাসে নির্ভরশীল। উঁচু জায়গা, পাহাড়ের পাদদেশ, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে তারা চাষ যোগ্য জমি নির্মাণ করত। গৃহপালিত পশু দ্বারা লাঙল টানা, গাড়ি টানা, চাষের জমি তৈরি, ইত্যাদির জন্য তারা গরু, মহিষ পালন করত। এই গরু, মহিষ দ্বারা তারা ধন-দৌলত উপার্জন করত। এই গরু, মহিষদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ বা সন্মান দানের জন্য তারা সহরায় উৎসব প্রচলন করে। এদের দেব-দেবী রূপে পূজিত করতে শুরু করে। যতদিন উৎসব পালন করা হয় ততদিন গরু-মহিষদের স্নান করিয়ে শিঙে তেল মাখিয়ে সেবা করা হয়। আদিমকাল থেকে এই

রীতি-আচার আসছে। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসি ও সমাজ’ গ্রন্থে লিখেছেন— ‘সহরায় উৎসবের সময়ে গৃহপালিত গবাদি পশুর কল্যাণ কামনায় জাগরণ গান গাওয়া হয়। এই কয়েকদিন গরু মহিষের শিঙ-এ তেল ও সিঁদুর মাখানো হয়।’ ‘সহরায়’ উৎসব পাঁচদিন ধরে পালন করা হয়—

ক. প্রথমদিন- উম দিন বা স্নান দিন।

খ. দ্বিতীয় দিন- গট পূজার দিন।

গ. তৃতীয় দিন- গোয়াল পূজার দিন।

ঘ. চতুর্থ দিন- খুটান পূজার দিন।

ঙ. পঞ্চম দিন- জাজলে বা শেষদিন।

উম দিন বা স্নান দিন: এই দিনে এই সমাজের মানুষেরা নিজ নিজ শয়ন ঘর, গোয়াল ঘর, আসবাপ পত্র, জামা-কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। এই দিনটিকে ধরা হয় বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দিন। বলা যায় যে এই দিনটি উৎসবটি পালন করার প্রাথমিক অবস্থা। এইদিন পূজার দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত রাখা থেকে পুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিভিন্ন কাজগুলি সম্পন্ন করা হয়। এই দিন বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়ে ‘সহরায়’ উৎসবের শুভ প্রারম্ভ হয়। যেমন—

“আজকে আমরা স্নান করছি
দল বদলি পুকুরে
কালকে পূজা করব
বড়ো বড়ো ছাতা বাড়িতে (....)”।

গট পূজা বা প্রণামী পূজা: এই দিন এই সমাজের যে কুল পুরোহিত সে সাঁওতাল সমাজে ‘নাইকে’ নামে পরিচিত। এই নাইকে পূজার দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে গ্রামের মানুষদের একত্র বা সমবেত করে পূজার স্থান যাবে। সেখানে গিয়ে সে পূজার স্থান তৈরি করে। এরপর যথারীতি আচার মেনে পূজা করে। প্রথমে কলসি ভরতি জল প্রস্তুত করে এবং মুরগীকে সমর্পণের মধ্যদিয়ে পূজা সম্পন্ন করে। ড. চতুর্ভূজ সাহু তাঁর ‘ঝাড়খণ্ড কি জনজাতিয়’ গ্রন্থে এই পূজা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন— ‘গ্রামের ‘নাইকে’ (পূজারী) সবাই আর সে উপোস রাখে আর পূজা অর্চনা করে।’ সাঁওতাল সমাজের প্রধান দেবতা ‘মারাং বুরু’(বড়ো পর্বত) তাকে পূজা অর্পণ করা হয় এবং

মনে সেই দেবতার কাছে গোয়াল ভর্তি গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি কামনা করা হয়। পূজার রীতি অনুযায়ী সেই গট পূজার স্থানে মুরগীর ডিম রাখা হয় এবং গ্রামের সবাই স্নান করানো গরুগুলিকে এই স্থানে নিয়ে এসে ডিমটির ওপর দিয়ে পার করানো হয়। যে গরু এই ডিমের ওপর দিয়ে পার হতে সক্ষম হয় সেই গরুকে গ্রামের কুল পুরোহিত 'নাইকে' শিঙে তেল মাখায়। যে গরুগুলি ডিম পার হতে
অক্ষম হয় তাদের 'নাইকে' (পুরোহিত) এক হাঁড়ি হাড়িয়া খেতে দেয়। এই আচার সাঁওতাল সমাজে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। 'হাড়িয়া' কথাটি যেহেতু উপস্থাপন হল সুতরাং সেই প্রসঙ্গে একটু আসা যাক। 'হাড়িয়া' সাঁওতাল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই সমাজের প্রতিটি পূজা উৎসবে তা ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে রামদাস টুডুর 'খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি'-তে বলা হয়েছে— 'হাড়িয়া 'ঠাকুর' পূজাতে পরিমাণ মতো খাওয়ার কথা বলেছে। তার বেশি খেলে খারাপ হবে।'

এই দিনের পূজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর গ্রামের মানুষ সমবেত হয় সন্ধ্যেবেলা এবং ঢামসা, মাদল সহকারে গোয়ালে গিয়ে নৃত্য গীতে অংশগ্রহণ করে। গরু-বাছুরগুলিকে জাগরণ করে অর্থাৎ তাদেরকে নিদ্রাভঙ্গ করে বা জাগায়- এই রীতিকে বলা হয় 'ডাংরা কাড়া জাগাও'। এই জাগরণের সময় এই রীতি অনুযায়ী গান গাওয়া হয়—

"অহি..............................রে
আশ্বিন মাস পেরিয়ে গেল কার্তিকে ঢুকিল মাস
পৌঁছে এল অমাবস্যার রাত্রি.........
জালা... না গো মা গোয়ালে সূতা আগুন,
করমা তেল দিয়ে জালিয়ে ভোর করো...
জাগরণ জাগরণ জাগব আমরা... অমাবস্যার রাত্রিটা।
এক জাতি আমরা জাগরণ সকাল করব।"
(রামেশ্বর মুর্মু- 'জাহের বঁগা সানতাড়ক')

এই ভাবে গোয়ালে নৃত্য গীতের মধ্য দিয়ে সেই দিনের পূজার সমাপ্তি ঘটে।
গোয়াল পূজা: এই দিন গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গোয়াল পূজা হয়। পালিত গরু, মহিষ, বাছুরদের স্নান করিয়ে তেল মাখিয়ে পেট ভরিয়ে রাখা হয় এবং সামনে ঘাস দেওয়া হয়। এই দিনে গোয়াল ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় কারণ এই দিনে গোয়াল ঘরটি সমগ্র সাঁওতাল জাতির কাছে পবিত্র স্থানের মর্যাদা পায়। ওই দিন বাড়ির

মহিলারা পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে নতুন কুলোতে পূজার দ্রব্য সামগ্রী যেমন, কাঁসার থালা, দূর্বা ঘাস ও আতব চাল বা ধান, ধূপ, প্রদীপ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে এবং সেই দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে মহিলারা গরু-বাছুর, মহিষদের পূজা আরতি করে, এই রীতিকে বলা হয় 'চুমাড়া'। এই রীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ও গান গাওয়া হয়—

"নতুন কুলা মাগো কিনে দাও
" " " "
আমি যাবোই মাগো কলি বেড়াতে।
কুলি বেড়াতে মাগো মোড়লদের বাড়ি
" " " " "
মোড়লদের বাড়ি মাগো গরু আরতি দিতে।"

খুটান পূজার দিন: এই দিন সাঁওতাল সমাজের কাছে সবচেয়ে আনন্দ খুশির দিন বলে মনে করা হয়। সমস্ত গরু-বাছুর, মানুষদের রঙ-বেরঙের সজ্জাতে সজ্জিত করা হয়। এই দিনে গরু-বাছুর মহিষদের দেহে রঙের ছাপ দেওয়া হয় এবং চালের গুড়ি তাদেরকে প্রদান করা হয়। গরু-মহিষদের একটি শক্ত পোক্ত শালের খুঁটিতে বাঁধা হয়। খুব শক্ত করে বাঁধা হয় যাতে দড়ি না ছিঁড়ে যায়। এই বাঁধার কাজটি করা হয় গ্রামের ফাঁকা জায়গায়, সেখানে গ্রামের সকলে সমবেত হয়ে এই কাজটি করে।

গ্রামের সকল মহিলারা একই রকম পোশাক পরিধান করে এবং সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সেই পূজার স্থানে যায়। নিমন্ত্রিত অতিথি মেয়ে-জামাই, বোন প্রভৃতি মানুষেরাও উপস্থিত হয় এই পূজার স্থানে। গ্রামের পুরুষেরা ঢামসা, মাদল সহকারে সেখানে উপস্থিত হয় এবং গরু-বাছুরদের নাচানো হয়। এই সময় গরু বাছুরগুলি রেগে গেলে পুরুষেরা তা দেখে আনন্দ উপভোগ করে। মনে করা হয় আমন ধান মাঠ থেকে তুলে আনবার ঠিক আগে এই খুটান উৎসব পালন করা হয় কারণ এর মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় গবাদি পশুর শারীরিক ক্ষমতা। খুটান শুরু করার আগে মহিলারা গানের মধ্য দিয়ে খুটান উৎসবের সূচনা করে—

"মোড়লদের বাহিরে গরু বাঁধছে
" " " "
পারানিক (মোড়ল দলের একটা পদ) দের বাহিরে কাড়া (গরু) বাঁধছে।"

সাঁওতালদের খুটান পূজার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের অনেক উৎসবের মিল লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় 'পোঙ্গল' উৎসব ও 'জাল্লিকাট্টু' উৎসব।

জালেমাহা বা শেষদিন: জালেমাহা হল 'সহরায়' উৎসবের শেষ দিন। 'জালে' যার অর্থ 'তৃপ্তি ভরে খাওয়া'। খুটান চলাকালীন গ্রামের পুরুষ মানুষরা যে গরু মহিষগুলি খুঁটিতে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল সেগুলি পুরুষ মানুষরা এই দিনে তুলবে বা উপড়াবে। এই দিনে সাঁওতাল জাতির মেয়ে-পুরুষেরা হাড়িয়া পান করে এবং নৃত্য গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে। আদিবাসী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত 'সাঁওতালি গানাংমালা' গ্রন্থে 'জালেমাহা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'শেষ দিনে বোনরা এটা ভুলে না মাঝ কুলহিতে (ফাঁকা জায়গায়) দাদারা খুঁটি গেড়েছে , উপড়ে ফেলানো শুধু না তারা গর্ত ভর্তি মনে করায়, না হলে অনেক বড়ো ক্ষতি হতে পারে।' এই সময় সাঁওতাল
বোনরা গানের মধ্য দিয়ে দাদাদের খুঁটি উপড়ানোর বিষয়গুলি মনে করিয়ে দেয়—

'খুঁটি দাদা উপড়ে দাও না, গর্ত দাদা ভরতি কর:
হাতির উপর দিশমপতি রাজা দাদা আসিতেছে যে।
হাতি দাদা... মরিবে।'

এই শেষদিন সাঁওতাল জাতির নারী-পুরুষেরা খুব আনন্দ করে। খুশির জোয়ারে ভেসে যায় তারা। কিন্তু উৎসব চলে যাওয়ার মুহুর্তে তাদের মন বিষাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা মনে মনে এই সময় ভাবে উৎসব শেষ হয়ে গেল আবার অনেকদিন পর আসবে। অর্থাৎ 'সহরায়' উৎসবকে কেন্দ্র করা সাঁওতালদের যে চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা তা সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু পাঁচদিনের 'সহরায়'' উৎসব আর দেখা যায় না পশ্চিমবঙ্গে। সাঁওতালি পণ্ডিতদের মতে উৎসব তিন দিনের হয়ে গেছে। তবে ঝাড়খণ্ডের কোনো কোনো স্থানে আজও পাঁচদিনের এ উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। আবার উৎসবটি একই মাসে ও সময়ে সব স্থানে অনুষ্ঠিত হয় না। প্রদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 'সহরায়' সাঁওতাল সমাজে একটা বড়ো স্থান দখল করে রেখেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসি ও সমাজ*, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৮৬
২. সাহু, ড. চতুর্ভূজ, *ঝাড়খণ্ড কি জনজাতিয়*, কে, কে পাবলিকেশন, এলাহাবাদ, ২০০২, পৃ. ৪৯
৩. সান্তালি গানাংমালা, *আদিবাসি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি*, জামসেদপুর, ২০১০, পৃ. ১১৭
৪. টুডু, বাপী, *সাঁওতালদের উৎসব*, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, অনুরণন পত্রিকা, ২০২২